আন্তর্জাতিক
কাস্টমস দিবস
২০২৩

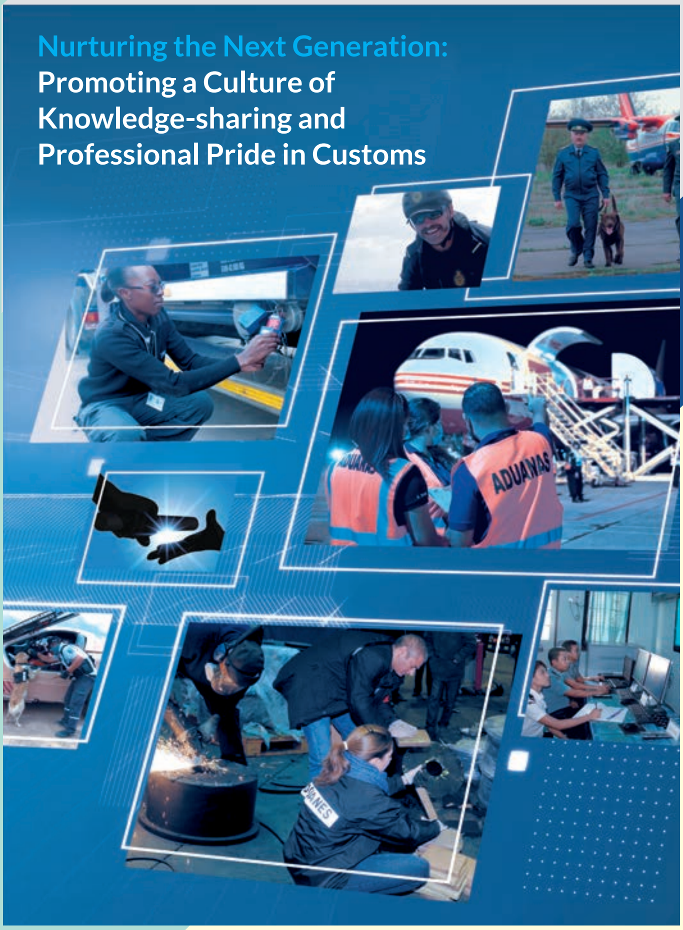

বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন?

আ আ ম আমীমুল ইহসান খান
নাহরিন রহমান স্বর্ণা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাথে সাথে মাথাপিছু আয় বাড়ার ফলে পণ্যের চাহিদাও আনুপাতিক হারে বাড়ছে। ফলে বৈচিত্র্যময় অঞ্চল থেকে বৈচিত্র্যময় পণ্যের বাণিজ্যও বাড়ছে। গত কয়েক দশকে শুল্ক-বাধাসমূহ উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পেলেও পণ্য খালাস প্রক্রিয়ায় নানা পদ্ধতিগত অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ কাস্টমস এর তথ্য মতে, ২০১০-১১ অর্থবছরে যেখানে প্রতিদিন গড়ে ৩,৪৩৩ টি বিল অব এন্ট্রি এবং বিল অব এক্সপোর্ট খালাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছিল, তা ২০২১-২২ অর্থবছরে এসে ১১,২৯৭ টি বিল অব এন্ট্রি এবং বিল অব এক্সপোর্টে উন্নীত হয়েছে, যা দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান বিকাশকেই প্রকাশ করে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বিগত এক যুগে সংখ্যার দিক থেকে আমদানি-রপ্তানি পণ্যচালানের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২২৯ শতাংশ।

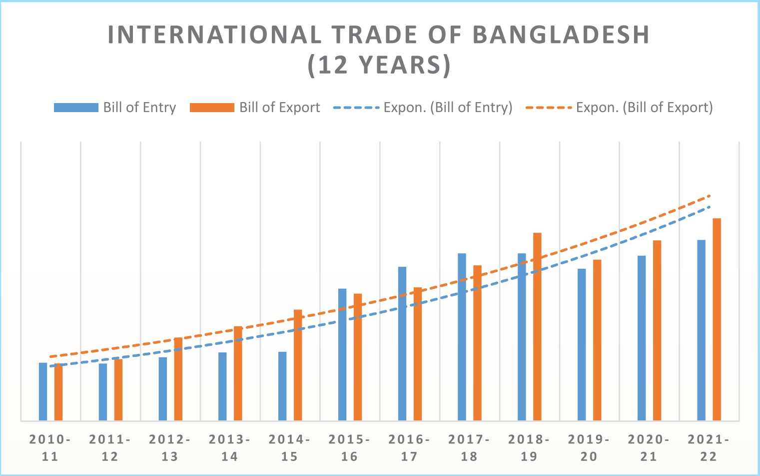

FY	Bill of Entry (per day)	Bill of Export (per day)	Total (Per day)	Growth
2010-11	1724	1709	3433	
2021-22	5329	5968	11297	229%

তবে এই পরিমাণ বাণিজ্য বাড়লেও জনবল ও লজিস্টিক সক্ষমতা সেই অনুপাতে বাড়েনি। ফলে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের এই দ্রুতবৃদ্ধির পাশাপাশি যুক্ত হওয়া নানা পদ্ধতিগত অনুষঙ্গ (procedural issues) পণ্যচালান খালাস কার্যক্রমে প্রভাব ফেলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত প্রশাসনিক, লজিস্টিক, আর্থিক ও মানবসম্পদ সক্ষমতা নিয়ে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য (cross-border trade) পরিচালনা এবং তা সহজীকরণ চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এতে আধুনিক ও পদ্ধতিগত কৌশল প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ এবং বাণিজ্য সহজীকরণের মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং বর্ধিত বাণিজ্যকে দক্ষতার সাথে ব্যবস্থিত করতে বিশ্বব্যাপী ঝুঁকি-ভিত্তিক পণ্যচালান খালাস ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় সব দেশই এখন সফলভাবে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ করছে এবং স্বল্প সময়ে পণ্যচালান খালাসপূর্বক বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কী?

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো ঝুঁকি-নিরূপণ ভিত্তিক পণ্যচালান খালাস ব্যবস্থা যা ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ ও উচ্চ-ঝুঁকি সম্পন্ন পণ্যচালান শনাক্তকরণপূর্বক কায়িক

পরীক্ষণে প্রেরণ এবং স্বল্প-ঝুঁকি সম্পন্ন চালান কায়িক পরীক্ষণ ছাড়াই কিংবা ন্যূনতম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রুত খালাস নিশ্চিত করে।

World Customs Organization (WCO) এর মতে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম। এটি প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতিগত প্রয়োগ যা তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে ঝুঁকিসম্পন্ন চালান চিহ্নিত ও প্রক্রিয়া করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, World Trade Organization (WTO) ঝুঁকিসম্পন্ন চালান নিয়ন্ত্রণে কাস্টমসের পাশাপাশি অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত সংস্থার ভূমিকার উপরও জোর দিয়েছে।

যেহেতু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং তথ্য-উপাত্ত নির্ভর ব্যবস্থা, তাই এটি সার্বিক আঙ্গিকে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ (control) এবং সহজীকরণের (facilitation) মাঝে সর্বোত্তম সমন্বয় ও ভারসাম্য নিশ্চিত করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে প্রেক্ষাপট প্রতিষ্ঠা (establishing the context), তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ (collection of information and intelligence), ঝুঁকি নিরূপণ (risk assessment) ও ঝুঁকি নিরসন (risk treatment)। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো উচ্চ-ঝুঁকির চালানসমূহের উপর শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ এবং স্বল্প-ঝুঁকির চালানসমূহের খালাস সহজতর ও ত্বরান্বিত করা। আর এই ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে ঝুঁকি মানদন্ড (risk criteria), ঝুঁকি সূচক (risk indicators) এবং ঝুঁকি প্রোফাইলিংয়ের (risk profiling) ভিত্তিতে। এই প্রোফাইলিং আবার প্রণয়ন করতে হয় বিভিন্ন ঝুঁকি ক্ষেত্র (risk area) মাথায় রেখে যার মধ্যে রয়েছে রাজস্ব, আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, কমপ্লায়েন্স, চোরাচালান প্রতিরোধ, পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা, জৈব নিরাপত্তা, ভৌত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, প্রভৃতি।

ঝুঁকির মানদন্ডসমূহের মধ্যে রয়েছে পণ্যের প্রকৃতি, বর্ণনা, এইচএস কোড, উৎস দেশ, শিপমেন্ট দেশ, ব্যবসায়ীর কমপ্লায়েন্স রেকর্ড, পরিবহণের ধরন, মৌসুম, চালানের মূল্য, প্রভৃতি। তাই সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যচালান টার্গেট করতে এ সকল মানদন্ড চিহ্নিতকরণ, পরিমাপ এবং মূল্যায়ন করার সক্ষমতা থাকতে হয়। এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপসমূহ (interventions) সবুজ, হলুদ, লাল, প্রভৃতি লেন-ভিত্তিক হয় যেখানে কমপ্লায়েন্ট ব্যবসায়ীগণ Authorized Economic Operator (AEO) অথবা Trusted Traders Programme অথবা একই ধরনের কাঠামোর অধীনে দ্রুত পণ্য খালাস সুবিধা ভোগ করে থাকে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও বাধ্যবাধকতা:

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন এবং ফোরামসমূহ আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সহজীকরণে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ম্যান্ডেট ও স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করে থাকে।

বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালে World Customs Organization (WCO) এর সদস্যপদ লাভ করে এবং ২০১২ সালে Revised Kyoto Convention (RKC) স্বাক্ষর করে। WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade প্রণয়নের মাধ্যমে সকল কাস্টমস প্রশাসনে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশ ২০১০ সালে SAFE Framework বাস্তবায়নে আগ্রহের কথা WCO কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে।

WTO Trade Facilitation Agreement (WTO TFA) অযৌক্তিক বৈষম্য ও ছদ্মাবরণে বিধিনিষেধ এড়াতে এবং স্বল্প-ঝুঁকির পণ্যচালানের দ্রুত খালাস নিশ্চিত করতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে তাগিদ দেয়। বাংলাদেশ ২০১৬ সালে TFA অনুসমর্থন (ratification) করে।

WTO TFA (Article 7.4: Risk Management) অনুযায়ী:

"7.4.1 প্রতিটি সদস্য কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের জন্য, যতদূর সম্ভব, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন ও অনুসরণ করবে।

7.4.2 প্রতিটি সদস্য এমনভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ করবে যাতে স্বেচ্ছাচারী বা অযৌক্তিক বৈষম্য, বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ছদ্মাবরণে বিধিনিষেধ এড়ানো যায়।

7.4.3 প্রতিটি সদস্য কাস্টমস নিয়ন্ত্রণে এবং যতদূর সম্ভব অন্যান্য সীমান্ত-সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণে, উচ্চ-ঝুঁকির পণ্য চালানসমূহের ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করবে এবং স্বল্প-ঝুঁকির চালানসমূহের খালাস ত্বরান্বিত করবে। প্রতিটি সদস্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের জন্য দৈবচয়ন ভিত্তিতেও পণ্যচালান নির্বাচন করতে পারে।

7.4.4 প্রতিটি সদস্য উপযুক্ত বাছাই মানদন্ডের মাধ্যমে ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করবে। বাছাই মানদন্ডসমূহের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি হারমোনাইজড সিস্টেম (এইচএস) কোড, পণ্যের প্রকৃতি ও বর্ণনা, উৎস দেশ, পণ্য জাহাজীকরণের দেশ, পণ্যের মূল্য, ব্যবসায়ীদের কমপ্লায়েন্স রেকর্ড এবং পরিবহণের ধরন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।"

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, WTO TFA কেবল কাস্টমস পদ্ধতি সহজীকরণের কথা বলে না বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অন্যান্য সীমান্ত সংস্থাসমূহের জোরালো ভূমিকাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement এ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং স্যানিটারি বা ফাইটোস্যানিটারি সুরক্ষার উপযুক্ত মাত্রা নির্ধারণের বিধান করেছে। চুক্তিতে বলা হয়েছে:

"সদস্যগণ নিশ্চিত করবে যেন তাদের স্যানিটারি বা ফাইটোস্যানিটারি ব্যবস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত ঝুঁকি মূল্যায়ন কৌশলসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে গৃহীত হয় (Article 5)।"

WTO Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement এও ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে যাতে বাণিজ্যে অপ্রয়োজনীয় বাধা সৃষ্টি না হয় (Article 2)।

WTO TFA অনুসমর্থনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণপূর্বক ঝুঁকি-ভিত্তিক কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ TFA'র অন্যান্য সহজীকরণ বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি সংশোধন করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি প্রাতিষ্ঠানিক, পদ্ধতিগত ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাসমূহের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির পরামর্শ দেয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় প্রেরিত অফিসিয়াল নোটিফিকেশন অনুসারে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বরাবরই বাংলাদেশের Category-C অঙ্গীকারে অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং এ বিষয়ে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করার বিষয়ে সরকার কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থাসমূহকে ম্যান্ডেট প্রদান করা হয়েছে।

WTO TFA পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার বিদ্যমান। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে TFA বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সংস্থাসমূহকে জবাবদিহি করতে জাতীয় পর্যায়ের কমিটি অর্থাৎ National Trade Facilitation Committee (NTFC) কাজ করছে। উল্লেখ্য, PQW, BSTI এবং BAEC সহ কতিপয় আন্তঃসীমান্ত সংস্থা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে Category-C এর আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে

আনুষ্ঠানিক পত্র পাঠিয়েছে যা WTO কে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিতও (official notification) করা হয়েছে।

তবে, বাংলাদেশ কাস্টমস দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করছে। বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ কাস্টম হাউসে (চট্টগ্রাম) ১০-১২% পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণ হচ্ছে এবং বাকি ৮৮% থেকে ৯০% চালান কোন প্রকার কায়িক পরীক্ষণ ছাড়াই খালাস হচ্ছে। আবার, Authorized Economic Operator (AEO) গণ সকল চালান বিনা পরীক্ষায় খালাসের সুবিধা ভোগ করছেন। কিন্তু কেবল কাস্টমস কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা, অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থাসমূহ এখনও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন না করায় এই উদ্যোগ থেকে বিভিন্ন অংশীজন পুরোপুরি সুফল পাচ্ছে না। তবে, বাংলাদেশ কাস্টমস কেন্দ্রীয়ভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট (CRMC) নামে একটি স্বতন্ত্র কমিশনারেটের কার্যক্রম চালু করেছে যা অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজ করতে পারবে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন?

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে ঝুঁকির মানদন্ড নির্ধারণ ও ঝুঁকি নির্দেশক চিহ্নিতকরণ এবং মানদন্ড ও নির্দেশক সমন্বয়ে ঝুঁকির প্রোফাইলিংয়ের ভিত্তিতে পণ্যচালান খালাস হয়ে থাকে। তাই পণ্যচালানসমূহ নির্বিচারে শতভাগ কায়িক পরীক্ষণ ও ল্যাব টেস্ট হয় না। বরং ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক নিম্ন-ঝুঁকির পণ্যের খালাস প্রক্রিয়া সহজ ও ত্বরান্বিত করা এবং মধ্যম-ঝুঁকির পণ্য সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস যাচাই-বাছাইপূর্বক খালাস প্রদান করা হয়। অপরদিকে, উচ্চ-ঝুঁকির চালানসমূহের ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ ও লোকবল নিয়োজিত করে কায়িক পরীক্ষণ, ল্যাব টেস্ট ও অধিকতর যাচাই-বাছাই করে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

যদি অতীত রেকর্ড, তথ্য-উপাত্ত এবং ব্যবসায়িক আচরণ বিশ্লেষণে নন-কমপ্লায়েন্স এর প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে নিম্ন ও মধ্যম-ঝুঁকি বিবেচনায় পণ্যচালান দ্রুত খালাস পায়। ফলে, বন্দর থেকে চালান খালাসে উল্লেখযোগ্যভাবে সময় হ্রাস পায়। এই হ্রাসকৃত সময় পোর্ট চার্জ, ফি এবং পোর্ট ডেমারেজ হ্রাসেও ভূমিকা রাখে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে পণ্যচালান খালাসের খরচ কমে যায়, যার প্রভাবে পণ্যের দামও কমে। আর পণ্যের এই দাম কমার চূড়ান্ত সুবিধা পান সাধারণ ভোক্তাগণ। এছাড়া, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্যান্য সুবিধার দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান সীমিত সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার, কমপ্লায়েন্স বৃদ্ধি, ব্যবসায়ী এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের মধ্যে সুষম সমন্বয়, প্রভৃতি। প্রাইভেট সেক্টরের আঙ্গিক থেকে বলা যায়, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৈধ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের অধিকতর সুবিধা ভোগ করার

এবং বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। রপ্তানির ক্ষেত্রেও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ বৈধ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের অধিকতর দ্রুতগতিতে রপ্তানি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের সুবিধা দেয়।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি নিরবচ্ছিন্ন সাপ্লাই চেইন নিশ্চিত করতেও অবদান রাখে, কেননা এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যকে দক্ষতার সাথে ব্যবস্থিত করা যায়। Covid-19 মহামারী নির্বিচারে সকল চালান কায়িক পরীক্ষণের বিকল্প হিসাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও আবশ্যিকতার দিকটিই প্রকৃষ্টভাবে সামনে এনেছে। বাণিজ্য সহজীকরণ ও পণ্যচালান দ্রুত খালাসে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন বাণিজ্য, লজিস্টিক এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশ্বিক সূচক এবং র‍্যাঙ্কিংয়েও বাংলাদেশের উন্নতি ঘটাবে, যা বিশ্বে একটি বিশ্বস্ত এবং দক্ষ বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে দেশের ভাবমূর্তিকে সমুন্নত করবে। এটি পণ্যের গড় খালাস সময়ের (average release time) উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে যা বিনিয়োগকারীদের অনুপ্রাণিত করবে এবং ফলস্বরূপ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) অধিকতর আকৃষ্ট হবে। এর ফলে বাণিজ্যের পরিমাণ ও বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যা কেবল এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জসমূহকেই প্রশমিত করতে অবদান রাখবে না, বরং ২০৪১ সালে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার যাত্রাকেও সহজ ও মসৃণ করবে।

কেন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা TFA'র একটি অনন্য (Unique) পদক্ষেপ?

WTO TFA'র মোট ৩৭ টি পদক্ষেপের (measures) মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি অনন্য (unique) পদক্ষেপ। অন্যান্য অধিকাংশ measure যেখানে কমপ্লায়েন্সের কথা বলে, বলে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ কিংবা পদ্ধতি সহজীকরণের কথা সেখানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঝুঁকি নিরূপণ করে স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য পরীক্ষণের মাত্রা ও হার হ্রাস করার উপর জোর দেয়। ফলে বিপুল সংখ্যক পণ্যচালান ত্বরিত খালাসের ফলে অর্থ ও সময়ের সরাসরি সাশ্রয় হয় যা TFA'র মূল ধারণা ও উদ্দেশ্য। একইসাথে এটি আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে একটি দেশের প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠার উপযুক্ত কৌশলও বটে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কী করা প্রয়োজন?

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সবার প্রথমে প্রয়োজন বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং এর ধারাবাহিকতায় খালাসোত্তর নিরীক্ষার (PCA) বিধান সংযুক্ত করা। বর্তমানে একমাত্র কাস্টমস আইনেই এই বিধান রয়েছে। তবে এভাবে অসংখ্য আইন ও বিধি সংশোধন দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং জটিল একটি বিষয়। এক্ষেত্রে আলাদা আলাদা সংশ্লিষ্ট সকল

আইন সংশোধন না করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ বাণিজ্য সহজীকরণের অন্যান্য বিধান অন্তর্ভুক্ত করে Trade Facilitation বিষয়ে একটি বিশেষ আমব্রেলা আইন প্রণয়ন করা যায় কিনা সেটি ভেবে দেখা যেতে পারে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এ ধরনের আইন রয়েছে বলে জানা যায়। আরো প্রয়োজন সংস্থাসমূহে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টিপূর্বক ফাংশনাল কার্যক্রম চালু করা, জনবলের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, অটোমেটেড সিস্টেম বা সফটওয়্যার প্রবর্তন, সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় বেসরকারি অংশীজনের অংশগ্রহণ, প্রভৃতি।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা

বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ TFA'র ক্যাটাগরি-সি এর আওতাভুক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ কাস্টমস এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষি বিভাগ (USDA) কৃষি, মৎস্য, প্রাণী ও খাদ্যপণ্য সংশ্লিষ্ট ছয়টি আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থাকে বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্পের (BTF) মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এদিকে, ২০২৬ সালের জুন মাসের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ তার অঙ্গীকার WTO কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে। এর অর্থ হলো উক্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা নিয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে হবে। সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বাকি মাত্র তিন বছরের কিছু বেশি সময়। এই সময় সুচারুরূপে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন না করতে পারলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর WTO'র বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাবে।

সবশেষে, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপত্তা ও ঝুঁকির সাথে আপস না করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ঝুঁকি নিরূপণের ভিত্তিতে পণ্যের ত্বরিত খালাস নিশ্চিত করা যেখানে নির্বিচারে শতভাগ পণ্যের ক্ষেত্রে কায়িক পরীক্ষণ অথবা ল্যাবে নমুনা পরীক্ষার প্রয়োজন পড়বে না। তবে, এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি সামগ্রিক এবং বহুস্তরবিশিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

লেখক: আ আ ম আমীমুল ইহসান খান, প্রথম সচিব (কাস্টমস), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (বর্তমানে সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসাবে ইউএসডিএ-বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট (বিটিএফ) এ লিয়েনে কর্মরত)। নাহরিন রহমান স্বর্ণা, টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর, বিটিএফ।